



INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

তারাশঙ্করের উপন্যাসে আদিবাসী জনজীবনের প্রতিফলন-একটি সমীক্ষা

শ্রী চন্দন মণ্ডল

গবেষক – বাংলা বিভাগ

সোনাদেবী বিশ্ববিদ্যালয় পূর্বসিংভূম ঝাড়খণ্ড

মুঠো ফোন ৯৪৩৪১১৭৯৪২

Abstract -

কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে বিশেষ করে গ্রাম - বাংলা শুধু নয় স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার যে সুবিস্তৃত অংশ সেখানকার আদিম আদিবাসী ও অন্ত্যজ নিম্নবর্ণীয় ব্রাত্য শ্রেণীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক জীবনচর্যার সামগ্রিক রূপ পরিস্ফুট। এই প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে উপন্যাসটি সর্বশ্রেষ্ঠ দাবির অধিকারী সেটি হল ‘অরণ্য-বহি’। এই উপন্যাসটি বিশ্লেষণের মাধ্যমে আদিবাসী জনজীবনের বিশ্বাস - সংস্কার সংস্কৃতির যে চিত্র উদ্ভাসিত হয়, সেই বিষয়টিই এই প্রবন্ধের আলোচনার বিষয়। উপন্যাসটিতে আদিবাসী সমাজের তথা জনজীবনের সংস্কৃতি, অর্থাৎ ধর্মীয় বিশ্বাস, রীতিনীতি বাক্যকেন্দ্রিক সংস্কৃতি অর্থাৎ ভাষা ব্যবহার নাচ- গান, জীবিকা, খাদ্যা- ভ্যাস তাদের আইন কানুন প্রথার যে চিত্রণ প্রস্ফুট হয়, তার মধ্য দিয়ে আদিবাসী জনজীবনের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক রূপ ও মানসিক অভিঘাতটি সুস্পষ্ট রূপে প্রতিফলিত। প্রত্যেক জনজাতির অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে তাদের সংস্কার ও সংস্কৃতি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘অরণ্য-বহি’ উপন্যাসে আদিবাসী জনজীবনের সংস্কৃতি, তাদের বিশ্বাস – সংস্কারের যে রূপরেখা পাওয়া যায় এই প্রবন্ধে তার স্বরূপ উদঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে।

Keyword – আদিবাসী, চুটি, বুলুং, কিরিস্থান

Discussion:

কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে বিশেষ করে গ্রাম - বাংলা শুধু নয় স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার যে সুবিস্তৃত অংশ সেখানকার আদিম আদিবাসী ও অন্ত্যজ নিম্নবর্ণীয় ব্রাত্য শ্রেণীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক জীবনচর্যার সামগ্রিক রূপ পরিস্ফুট। এই প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে উপন্যাসটি সর্বশ্রেষ্ঠ দাবির অধিকারী সেটি হল ‘অরণ্য-বহি’। এই উপন্যাসটি বিশ্লেষণের মাধ্যমে আদিবাসী জনজীবনের বিশ্বাস - সংস্কার সংস্কৃতির যে চিত্র উদ্ভাসিত হয়, সেই বিষয়টিই এই প্রবন্ধের আলোচনার বিষয়। উপন্যাসটিতে আদিবাসী সমাজের তথা জনজীবনের সংস্কৃতি, অর্থাৎ ধর্মীয় বিশ্বাস, রীতিনীতি বাক্যকেন্দ্রিক সংস্কৃতি অর্থাৎ ভাষা ব্যবহার নাচ- গান, জীবিকা, খাদ্যা- ভ্যাস তাদের আইন কানুন প্রথার যে চিত্রণ প্রস্ফুট হয়, তার মধ্য দিয়ে আদিবাসী জনজীবনের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক রূপ ও মানসিক অভিঘাতটি সুস্পষ্ট রূপে প্রতিফলিত। প্রত্যেক জনজাতির অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে তাদের সংস্কার ও সংস্কৃতি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘অরণ্য-বহি’ উপন্যাসে আদিবাসী জনজীবনের সংস্কৃতি, তাদের বিশ্বাস – সংস্কারের যে রূপরেখা পাওয়া যায় এই প্রবন্ধে তার স্বরূপ উদঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে।

এখন প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক এই আদিবাসী কারা? “আদিবাসী কথাটি সাম্প্রতিককালে বহুল ব্যবহৃত ও চর্চিত শব্দ। আদিবাসী বলতে যে জনগোষ্ঠী বুঝায় তারা আমাদের সামাজিক জীবনের সঙ্গে নানা ভাবে যুক্ত। সাহিত্যের ক্ষেত্রে জয়দেবের রচনায় কিংবা চর্যাপদের কোন কোন পদে শবর প্রমুখ প্রজাতীয় রাগ রাগিনীতে পদগুলির গাওয়ার নির্দেশ পাওয়া যায়। বহু প্রাচীন মন্দিরের গায়ে শিল্পকলায় তাদের পর্ণভূষিত চিত্র আছে। বৃহদ্রম পুরাণ ও ব্রহ্ম-বৈবর্ত পুরাণ প্রভৃতি ঐতিহাসিক কালের গ্রন্থে নানা উল্লেখ আছে। বিবাহ অনুষ্ঠানে হলুদ, পান ইত্যাদি ব্যবহারের রীতির মধ্যে কেউ কেউ আদিবাসীদের প্রভাব খুঁজে পেয়েছেন। প্রাচীনকালে থেকে ভারত ভূমিতে বিভিন্ন অঞ্চলে নানা আকৃতির বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ চোখে পড়ে এদের মধ্যে কোন কোন গোষ্ঠী প্রাচীন সংস্কৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বর্তমান সভ্যতার সংস্পর্শ থেকে অনেক দূরে বাস করে আসছে। এরা হাজার হাজার বছর আগে ভারতের নানা প্রান্তে বসতি স্থাপন করেছিলেন। সুদূর অতীতে প্রাক-আর্য যুগে এরাই প্রথম সভ্যতার পত্তন করেন। এদেরই অনার্য গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কালক্রমে আর্যদের ভারতে আগমনের ফলে আর্য সংস্কৃতির সংঘাতে তারা বাধ্য হয়ে মানুষের সংস্পর্শের বাইরে জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে গিরি গুহায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন সেজন্য আপাতদৃষ্টিতে এদের জীবনে সেরকম দ্রুত পরিবর্তন না ঘটায় এখনো বর্তমান সমাজ ও অর্থনৈতিক কাঠামোয় অনেকটা অনগ্রসর সম্প্রদায়ের উপর পরিগণিত হচ্ছেন। এই প্রাচীন গোষ্ঠীর প্রকৃতি নির্ভরশীল মানুষকে বলা হয় উপজাতি বা আদিবাসী।”^১ ড. রিভার্স [Rivers] বলেছেন : যা সমাজের একটি গোষ্ঠী যাদের জীবনের জটিলতা নেই যারা এখন ও একই ভাষায় কথা বলে মনের ভাব প্রকাশ করে, যাদের আকৃতি বা সংস্কৃতিগত সাদৃশ্য আছে, নিজেদের নিয়ম কানুন রক্ষার জন্য তাদের পঞ্চায়েত আছে এবং প্রয়োজন হলে যারা গোষ্ঠী সচেতন মনোবৃত্তি নিয়ে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সংগ্রাম করে থাকে।

“আদিবাসীরাই ভারতের প্রকৃত স্বদেশী বা প্রাচীনতম আদিবাসী ;তাদের কাছে আর সকলেই বিদেশী। এই প্রাচীন জাতিরই নৈতিক দাবি ও অধিকার হাজার হাজার বছরের পুরানো।”^২ আমরা যারা এই সকল সম্প্রদায় বিশেষকে উপজাতি গোষ্ঠী বলে জানি। যারা এখনো নিজস্ব সত্তা বজায় রেখে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস করে থাকেন যারা অন্তঃবিবাহকারী গোষ্ঠী রূপে পরিচিত এবং রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষা করে ও গোষ্ঠী সচেতন মনোবৃত্তি নিয়ে বেঁচে থাকা এদের বৈশিষ্ট্য। দৈহিক বৈশিষ্ট্যের তারতম্য অনুযায়ী তিনটি শ্রেণীতে পৃথক হয়েছেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘অরন্য- বহিঃ’ উপন্যাসে যে জনজাতির কাহিনী বিবৃত হয়েছে তারা ভারতবর্ষের সমতল ভূমিতে ছড়িয়ে আছেন। তাদের গায়ের রং কালো, বাদামী। চুলের আকৃতি ঢেউ খেলানো উচ্চতা মাঝারি নাক চওড়া ঠোঁট মোটা এরাই হলেন প্রাচীন অস্ট্রিক, লোথা, সাঁওতাল, মুন্ডা, গুঁরাও, হো, গন্ড, ভিল, চেঞ্চু প্রমুখেরা এই সম্প্রদায় ভুক্ত। এদের অর্থনৈতিক জীবনের মধ্যে বেশ বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। পরিবেশ পরিমণ্ডলকে কেন্দ্র করে এদের অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠেছে। এদের কেউ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বনজাত সম্পদের উপর নির্ভরশীল। যেটা আদিম বৃত্তি এখনো বনজঙ্গল থেকে গাছের ফলমূল পাতা মধু গুটি পোকা লাফা গাছের ছাল সংগ্রহ করে। এদের কোনোটি খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে আবার কোনটি বাজারে বিক্রি করে অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য কিনে নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকেন। প্রতিটি গোষ্ঠীর নিজস্ব স্বতন্ত্র সামাজিক কাঠামো রয়েছে। তার প্রভাব প্রতিফলিত হয় পারিবারিক জীবন বিবাহ ধর্ম সংস্কৃতি নাচ গান এবং অনুশাসন প্রভৃতির মধ্যে। এরা যেন অনেক তার দ্বারা একত্রে এক সূত্রে বাধা রয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের দেশে যে সং-বিধান তৈরি হয়েছে তাতে ভারতের পিছিয়ে পড়া দুর্বল শ্রেণীর মানুষকে তপশিলভুক্ত করা হয়েছে যারা এর মাধ্যমে সংবিধানিক সুযোগ-সুবিধা পেতে পারেন।

ভারতবর্ষের আদি বসবাসকারী মানবজাতিই ‘আদিবাসী’ আর্য - পূর্ব ভারতে আদিম বাসিন্দা যারা তারা আর্যদের ভারতে আগমন ও বসতি স্থাপনের পর নিজ বাসস্থান ছেড়ে আর্যদের কাছে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বনে জঙ্গলে পাহাড় পর্বতে আশ্রয় নেয়। ফলত আর্য সংস্কার সংস্কৃতি তাদের গ্রাস করতে পারেনি এবং আদিবাসীদের এক সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় আছে। ‘সংস্কৃতি’ বা ‘Culture’ একটি জাতির পরিচয়ের অন্যতম উপাদান। তবে মনে রাখতে হবে সংস্কৃতি চির প্রবাহমান যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তিত হয়। সংস্কৃতি মানুষকে সামাজিক জীবনে পরিণত করে। তার মধ্য দিয়েই মূল্যবোধ নানান ধ্যান ধারণা সুদৃঢ় মন মানসিকতার অধিকারী হয় মানুষ। সংস্কৃতিই মানুষকে একটা পূর্ণ মানুষ এবং একটি জাতিকে আলাদা পরিচয় ও গঠন দেয়। সংস্কৃতি- সংস্কার একটি অতি জটিল ধারণা। এই সংস্কৃতিই একটা জাতির স্বাতন্ত্র্যতা তৈরি করে বিশ্বখ্যাতি এনে দেয়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ‘এডওয়ার্ড টেইলার’ সংস্কৃতির যে সংজ্ঞা দেন তা ধ্রুপদী সংজ্ঞা হিসাবে বিবেচিত। টেইলারের কথা মত মানুষের বিশ্বাস আচার-আচরণ এবং জ্ঞানের একটি সমন্বিত প্যাটার্ন কে বলে সংস্কৃতি। সংস্কৃতি বা কৃষ্টি হল সেই জটিল সামগ্রিকতা। যার অন্তর্গত জ্ঞান বিশ্বাস নৈতিকতা শিল্প আইন রাজনীতি আচার এবং সামাজিক সদস্য

হিসাবে একজন মানুষের দ্বারা অর্জিত অন্য যেকোনো সম্ভাব্য সামর্থ্য বা অভ্যাস। এই সংস্কৃতিরই অন্তর্গত সংস্কার। সংস্কার থেকেই মানুষের মনে বিশ্বাস কুসংস্কারের তৈরি হয়। সংস্কার থেকে নানান আচার ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করতে করতে মানুষের মনে অনেক ধরনের বিশ্বাস তৈরি হয়। এই বিশ্বাস থেকে অনেক ভ্রান্ত বিশ্বাস বা ধারণা বা কুসংস্কার তৈরি হয়। আমাদের সমাজে যেমন নানা স্তরবিভাজন রয়েছে তেমনি সংস্কৃতি ও বহু রঙে রাঙ্গাযিত। উচ্চবর্ণ সমাজের হিন্দু সমাজ আর নিম্নবর্ণের হিন্দু সমাজ অর্থাৎ যারা অন্তর্জ সংস্কৃতি অনেক আলাদা। আবার ধর্ম ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্তর্জ শ্রেণীর সংস্কারে মিল রয়েছে অনেক। পৃথিবীর সমস্ত জাতির নিজস্ব সংস্কৃতি ধারণা বিশ্বাস সংস্থার বিদ্যমান।

সংস্কার সংস্কৃতিকে ভিত্তি করেই একটি সমাজ ধারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পাশাপাশি আদিবাসী সমাজে প্রথাগত রীতি নীতি পালন ও সেগুলো রক্ষণ এবং প্রয়োগের জন্য নিজস্ব আইন ও নির্বাচিত পঞ্চায়েত থাকে। এই পঞ্চায়েতের হাতে অনেক অলিখিত কঠিন শাস্তি পেতে হয়। শুধু তাই নয় এই সকল গ্রামীণ মানুষদের মধ্যে নিয়ম কানুন বিশ্বাস- সংস্কার মোড়লদের মান্যতা দেওয়া কি রকম আর্স্টেপুটে বাঁধা তা আমরা উপন্যাসটি আলোচনার মধ্য দিয়ে দেখব। তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘অরণ্য-বহি’ উপন্যাসটি বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এই একদিকে যেমন অনার্য আদিবাসী মানুষের সংস্কার-সংস্কৃতির এক অনন্য রূপের পরিচয় পাই। তেমনি এই আলোচনার মধ্য দিয়ে তাদের আর্থ - সামাজিক অবস্থানটি ও পরিস্ফুট। উপন্যাসটির মধ্য দিয়ে ইংরেজের নীলকর তথা সাহেব হিন্দু মহাজনদের নির্মমতা যেমন প্রস্ফুটিত তেমনি আদিবাসী সম্প্রদায়ের এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া তাদের অসহায়তা অধিকার অর্জনের জন্য অস্ত্র ধারণ থেকে নরহত্যা বাধ্য হওয়া সবই চিত্রের মতো ফুটে উঠেছে।

তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘অরণ্য- বহি’ উপন্যাসে আদিবাসী সমাজ তথা সাঁওতালদের নানান সামাজিক আচার বিশ্বাস তাদের গান ছড়া সংস্কার সংস্কৃতির পরিচয় বর্ণিত। তারাক্ষরের পরিণত বয়সের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের মধ্যে ‘অরণ্য- বহি’ একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। প্রবীণ কথাকারের রচনায় চাতুর্য ও চমৎকারিত্ব এই উপন্যাসটির পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। সাঁওতাল বিদ্রোহ নিয়ে এত সুন্দর উপন্যাস বোধ হয় তার আগে আর কেউ লেখেন নি। তারাক্ষরের জন্ম সময়ে এবং বাল্যকালে ও বাংলা বিহার উড়িষ্যা ছিল এক প্রদেশের অন্তর্গত। সাঁওতাল বিদ্রোহের আগে সাঁওতাল পরগনা জেলার সৃষ্টি হয়নি তখন বীরভূম জেলার মধ্যে সাঁওতাল পরগনা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে সংগঠিত সাঁওতাল বিদ্রোহের এক সজীব ও নিখুঁত চিত্রের চমৎকারিত্বে মুগ্ধ হতে হয়। অরণ্যচারী আদিম আদিবাসীদের সরল জীবনযাত্রা কিভাবে বিদেশি শাসকগোষ্ঠী এবং তাদের প্রতিভুরূপে বাঙালি জোতদার ও পশ্চিমা ব্যবসায়ির দল এবং মহেশ দারোগার মত মানুষ নষ্ট ও যুথভ্রষ্ট এবং ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিল তারই অপকৃপ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে অরন্য বহিতে। ‘অরণ্য- বহি’ তে অত্যাচারীদের প্রতি বিদ্রোহের কারণগুলি প্রবীণ কথাকার সুনিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন। কিভাবে বিদেশি শাসকগোষ্ঠী এবং বাঙালি ও পশ্চিমা শাসকদের শোষণে ও নিষ্পেষণে এই আদিম অরণ্যচারী জাতি ধ্বংসের মুখে চলে যাচ্ছিল তার একটি সুন্দর চিত্র আছে ‘অরণ্য- বহি’ তে।

অরণ্যচারী আদিম জাতির ওপরে শত সহস্র রকমের অত্যাচার একদিন সিধু ও কানুর নেতৃত্বে অরণ্যে দাবাগিরি সৃষ্টি করেছিল। তারই ইতিহাস ও শৈশবকালে শোনা কাহিনী কল্পনার রঙে রাঙিয়ে পরিবেশন করেছেন প্রখ্যাত কথাকার। বীরভূম ও সাঁওতাল পরগণার সন্নিহিত স্থানে অবস্থানের জন্য একেবারে নিখুঁত ও বাস্তবোচিত পটভূমি রচনা করতে পেরেছেন। তারাক্ষর ছিলেন বীরভূম ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের সাঁওতাল বাউরী বাগদি প্রভৃতি তথাকথিত অন্তর্জ শ্রেণীর অত্যন্ত কাছের মানুষ। তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছেন তাদের জীবনযাত্রা তারই পরিচয় পাওয়া যায় ‘অরণ্য-বহি’তে।

প্রথমেই আমরা উপন্যাসিকের সঙ্গে স্থান কাল পটভূমির পরিচয় নিয়ে নিই। আমরা লেখকের সঙ্গে ১১২ বছর পেছনে পৌঁছে গেলাম সন ১৮৫৪ তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমল। তখন বাংলাদেশ বলতে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা তিন প্রদেশকে একসঙ্গে বোঝাত। সে অঞ্চলের কথা তারাক্ষর বলেছেন সে অঞ্চল উত্তরে ভাগলপুর থেকে গঙ্গার পশ্চিমে তিনপাহাড়, রাজমহল থেকে দক্ষিণে বীরভূম জেলার ময়ূরাক্ষীর উত্তর এবং গোটা সাঁওতাল পরগনা এবং দেওঘর নিয়ে একটি বিস্তীর্ণ এলাকা।

রাজমহল থেকে সমস্ত দক্ষিণ এলাকা তখন জেলা মুর্শিদাবাদের এলাকা। দেওঘর সাঁওতাল পরগনা নিয়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চল বীরভূম জেলার অন্তর্ভুক্ত। নবাবী আমলে এর সমস্তটাই ছিল বসতিহীন অরণ্যভূমি। ইংরেজের দেওয়ানির পর পার্মানেন্ট সেটেলমেন্টের সময় থেকে এসব অঞ্চলে বন কেটে

চাষের ক্ষেত তৈরি হচ্ছে। পাহাড়ের মাথায় সাঁওতালদের গ্রাম থেকে সাঁওতালার সমতলে নেমে এসে গ্রামে বসতি তৈরি করে জমি ভাঙছে। হিন্দু ব্যবসাদার গৃহস্থ এরাও চাষের ক্ষেত তৈরি করে অঞ্চলটা চেহারা অনেকটা পাল্টে দিয়েছে। ওদিকে গঙ্গার স্রোতকে পূর্ব দিকে রেখে তার সঙ্গে প্রায় সমান্তরাল রেখায় রেললাইন বসাবার কাজ চলছে পুরোদমে, মধ্যে মধ্যে নীলকুঠি বসিয়েছে সাহেবরা তার সঙ্গে রেশম কুঠী। খ্রিস্টান মিশনারীরা পার্বত্য এলাকায় মিশন গেড়ে বসেছে।

গ্রামগুলি সবই প্রায় মাটির দেওয়াল, খড়োচাল এবং খাপরার চালের বাড়ি ঘরের গ্রাম। হাজারটি বাড়ির মধ্যে দশটি কি বিশটি পাকা বাড়ি। রাজমহলে ছিল নবাবী আমলে নবাবীমহল। বড় ব্যবসাদারদের পাকা বাড়ি। বীরভূমে রাজনগরে মুসলমান রাজা সাহেবের পাকা বাড়ি, ছোট জায়গীরদার বা তালুকদারদের বাড়িঘরের অর্ধেক পাকা অর্ধেক কাঁচা। দু'চারটি গ্রাম অন্তর একটি হিন্দুর গ্রামে দুটি চারটে পাকা শিব মন্দির মুসলিমদের পাকা মসজিদ। মাটি পুড়িয়ে লোকে ঘরে বাস করত না। গ্রাম থেকে গ্রামে ছিল কাঁচা মাটির রাস্তা।

এখানে আরেকটি কথা উপন্যাসিক বলতে ভুলে যাননি সেটা হল সাঁওতালদের ধর্মান্তরিত হওয়ার কথা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা ধর্মান্তরিত হয়েছে নিজেদের জীবনধারাকে নিরুপদ্রব নিশংসয় নিশ্চিন্ত জীবন যাপনের স্বার্থে। মিশনারিদের প্রচেষ্টায় অনেকে খ্রীষ্টান হয়েছেন। বোঙ্গা বিশ্বাসী সাঁওতালেরা খ্রিস্ট ধর্মান্তরিত সাঁওতালদের সহ্য করতে পারতেন না এরা উৎসব অনুষ্ঠানে ধর্মান্তরিত সাঁওতালদের এক সঙ্গে বসতে দিত না। একই ঘাটে জল নিতে দিত না আগুন চাইতে গেলে মেয়েদের উঠানে ঢুকতে দিত না। বাইরে থেকে দিত। আবার কেউ কেউ আগুন পর্যন্ত দিত না কিংবা চুন তামাক দিত না। কোনো কিছু ছোঁয়া খেত না, তারা একরকম ঘৃণা করতো এবং অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিত। সাঁওতাল বিদ্রোহের কারণের মধ্যে রয়েছে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত। কারণ ঐ সময় সাঁওতালেরা খুব আনন্দের সঙ্গে দিন কাটা- চিলা। যেখানেই ছাতা উৎসব, পাতা উৎসব, কালী পূজার খবর পেত সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামের ছেলেমেয়েরা মাদল টামাক করতাল বাঁশি নিয়ে নাচ গান করতে যেত আর গ্রামে ও প্রতিদিন একনাগারে নাচতো ওই সময় এটাই ছিল সাঁওতালদের বড় আনন্দ। এছাড়া তারা অন্য ভাল কিছু জানতো না। যুবকরা দাঁসায় নাচ করত কম বয়সী ছেলেরা দুঙ্গের নাচ করত।

সমগ্র 'অরণ্য- বহ্নি' উপন্যাসে বর্ণিত এলাকাটি তথা ভূমিটি পুরোটিই পাথর কাঁকর আর লাল মাটির অঞ্চল। শক্ত কঠিন রুক্ষ মাটি। লাল ধুলোয় ভরা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যেতে শালবনের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। মাঝে মাঝে বিস্তীর্ণ প্রান্তর সে প্রান্তর ধূসর রুক্ষ মধ্যে মধ্যে বড় বড় পাথরের চাঁই মাথা উঠিয়ে বসে আছে। কোথাও কোথাও দু-চারটে পঁচিশ থেকে ত্রিশ চল্লিশ ফুট উঁচু পাথরের ডিবি তাকে ঘিরে শাল গাছ। কোথাও কোথাও বড় বটগাছ ও আছে। তারপর মাইল মাইল বিস্তীর্ণ শাল জঙ্গল কোথাও কাঁঠাল গাছ আবার কোথাও কাঁচা সোনার রঙের শিমুল ফুলের মত বড় বড় ফুলে ছেয়ে বনভূমি। গাছগুলি একেবারে ন্যাড়া, আঁকা বাঁকা কাণ্ড। বসন্তে আছে পলাশ ফুল।

গোটা সাঁওতাল পরগনা পার্বত্য অরণ্য অঞ্চল। তাই দেখতে পাবো হেঁড়োল, নেকড়ে, হায়েনা কোথাও চিতা বাঘ গুলবাগা আছে ঝিঙে ফুলে চিতা। নয়তো বেরিয়ে আসবে ভাল্লুক গাছের ডালে জড়িয়ে আছে পাহাড়ে চিতা। হয়তো বা দেখতে পাবেন হরিণের পালের দুরন্ত বেগে ছুটে যাওয়া কোথাও ময়ূর ডাকবে গাছের মাথায় বসে। তার সঙ্গে নানান জাতির পাখির কলরব।

পাহাড়ের মাথায় সাঁওতালদের গ্রাম থেকে সাঁওতালদের নীচে আবাদি জামিন বা জন্দি। এলাকার গ্রাম থেকে সাঁওতালদের সাড়া পাওয়া যাবে। এই সাঁও- তালেরা অরণ্য মানুষ কালো রং পরনে মাত্র একফালি কাপড় মাথায় বাবরি চুল তাতে ফুল গোঁজে কানে ফুল গোঁজে পুতির মালা গলায় পরে, হীরে মণিমাণিক্যের কণ্ঠহার পরার আনন্দ উপভোগ করে। বন্য জন্তু মারলে ও এরা চোর নয় লুঠেরা নয়। এভাবেই প্রকৃতির কোলে সাঁওতাল ছেলেমেয়েরা বড় হয়, শৈশব থেকে কৈশোরে, কৈশোরে থেকে যৌবনে পদার্পণ করে। তখন তাদের কণ্ঠে জাগে বিচিত্র মধুর সঙ্গীত-

“বির্ বাড়্‌গে নওয়া অড়াঃক্’ কঃক্’ আলাং,

রাজারাণী নন্ডে আলাং কঃক্’ আলাং,

রেঙ্গেচ্ জালা দ লাং এড়ের গিডিয়া,

সেমা রেয়াঃক্ সুকলাং ভুঞ্জাও সুকজংআ”

অর্থাৎ-- “এ বনভূমিতে আমরা ঘরবাড়ি তৈরি করব,

রাজারাণী হয়ে আমরা থাকব,

জগতের দুঃখ-কষ্ট আমরা ভুলে যাব,

স্বর্গীয় আনন্দ আমরা উপভোগ করব।”^৩

রমণীরা বা মেয়েরা কষ্টিপাথরের খোদায় পড়া করা সুঠাম গঠন নারী মূর্তি। ডাগর চোখ, কপাল ছোট, মাথার চুল ঘন কিন্তু লম্বায় খুব দীর্ঘ নয়। সিঁথি কাটে না সমান করে উজিয়ে টেনে চুল পাকিয়ে খোঁপা বাধে। খোঁপায় থাকে জিজির গাঁথা কাঁটা ফুল।^৪ কিন্তু তাও দেখা যায় না। সেখানে থোকা থোকা হলুদ ফুল আর লাল ফুল গুঁজে রাখে। এদের পরনে দু প্রস্থ সাঁওতালী তাঁত বোনা মোটা সুতোর কাপড়; রঙ্গিন একপ্রস্থ কোমড় থেকে নীচের দিকে অপর প্রান্তটাকে কোমরে গুঁজে বুক ঢেকে পিঠ বেড়ে কোমড়ে আঁট সাঁট করে জড়িয়ে গোঁজে। গলায় ওই ওদের হীরে মানিক রঙিন পুঁতির মালা। রঙিন ফুলের সঙ্গে পুঁতির মালা আর এক ফালি আড়াই হাত লম্বা উজ্জ্বল রঙের কাপড়।

উপন্যাসিক কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের মেলবন্ধনের একটি প্রচেষ্টা করেছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন সেকালের সাঁওতাল বিদ্রোহের মধ্যে দুর্গাপূজার সমারোহে আমরা যারা বাঙালি তারা সকলেই বিশেষ করে যারা হিন্দু সমাজের প্রতিনিধি জানি যে বিজয়া দশমীর দিন সাঁওতালদের মহোৎসব। যেখানে তারা হাঁড়িয়া খেয়ে আপন আপন সবথেকে উজ্জ্বল পোশাক পরে মাথায় ময়ূরের পালক বেঁধে যুদ্ধ-নৃত্যের প্রমত্ততার অনুকরণ করে। এ উৎসব তাদের আজও আছে। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের দুর্গাপূজার বা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী ওই সম্প্রদায়ের আরাধ্য দেবী মা বোঙ্গার ঠাই অর্থাৎ মা দেবতার স্থান। উপন্যাসিক যাকে বলেছেন দুর্গাপূজার স্থান। উপন্যাসে কাল বর্ণনাকালে দ্বিতীয় দশমীতে এবং একাদশীতে সাঁওতালরা দলে দলে এসে প্রণাম করে যায়। সাঁওতালদের বিশ্বাস মা কালী তার সেবক ভৈরবী কোথাও যেন রুদ্রমূর্তি একাকার হয়ে যান। সাঁওতালরা দেবতাকে বলে ‘বোঙ্গা’ আর দেবতা যেখানে থাকেন সাঁওতালরা সেই ঠাই কে বলে ‘জহর সর্গা’, জহর সর্গা হলো সাঁওতালদের কাছে পবিত্র স্থান। যেটি উপন্যাসে ‘বাগনাডিহি’ গ্রামে অবস্থান করেছিল। এই পবিত্র স্থানে বজ্রপাতকে সাঁওতাল সম্প্রদায় আশীর্বাদ হিসেবে বিবেচনা আবার কেউ কেউ দেবতার ক্রোধ মনে করে। যেমন উপন্যাসে আমরা দেখি চূড়া মাঝির বুড়িমা কপালে হাত চাপড়ে বলে উঠলো “আক্লাই আক্লাই পাপে এই বড় পাথরখানা ফেটে দুটো হয়ে গেল।”^৫ অন্যদিকে সিধু বলে – “আক্লাই হল না তা হলে জল পড়তো না টিপিং টিপিং করে। দেখবি দু দিন বাদে উখান থেকে পানি ঝরবেক। ঝরনা বাইরাবে। ই লক্ষণ ভালো বেটে, খারাপ লয়। পাথর ফাটলে বোঙ্গা। পানি দিলে।”^৬

অন্যদিকে এখানে আরেকটি কথা উপন্যাসিক বলতে ভুলে যাননি সেটা হল সাঁওতালদের ধর্মান্তরিত হওয়ার কথা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা ধর্মান্তরিত হয়েছে নিজেদের জীবন ধারাকে নিরুপদ্রব নিশংসয় নিশ্চিত্ত জীবন যাপনের স্বার্থে। মিশনারিদের প্রচেষ্টায় অনেকে খ্রীষ্টান হয়েছেন। বোঙ্গা বিশ্বাসী সাঁওতালেরা খ্রিস্ট ধর্মান্তরিত সাঁওতালদের সহ্য করতে পারতেন না এরা উৎসব অনুষ্ঠানে ধর্মান্তরিত সাঁওতালদের এক সঙ্গে বসতে দিত না। একই ঘাটে জল নিতে দিত না আগুন চাইতে গেলে মেয়েদের উঠানে ঢুকতে দিত না বাইরে থেকে দিত। আবার কেউ কেউ আগুন পর্যন্ত দিত না কিংবা চুন তামাক দিত না। কোনো কিছু ছোঁয়া খেত না, তারা একরকম ঘৃণা করতো এবং অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিত। সাঁওতাল বিদ্রোহের কারণের মধ্যে রয়েছে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত। কারণ “ঐ সময় সাঁওতালেরা খুব আনন্দের সঙ্গে দিন কাটাচ্ছিল। যেখানেই ছাতা উৎসব, পাতা উৎসব, কালী পূজার খবর পেত সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামের ছেলেমেয়েরা মাদল টামাক করতাল বাঁশি নিয়ে নাচ গান করতে যেত আর গ্রামেও প্রতিদিন একনাগারে নাচতো ওই সময় এটাই ছিল সাঁওতালদের বড় আনন্দ। এছাড়া তারা অন্য ভাল কিছু জানতো না। যুবকরা দাঁসায় নাচ করত কম বয়সী ছেলেরা দুগ্গের নাচ করত।”^৭

শিকার জঙ্গল হল সাঁওতালদের হাইকোর্ট বিচারে অপরাধীর বাড়িতে উঠানে দুগ্গের নাচ করা হতো এবং নানা রকম কুৎসিত গান গাইত। সবাই রাস্তার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত দুবার ঘুরে বেড়াত এবং শেষে ওই লোকের বাড়ির উঠানে ভাঙ্গা কুলো ঐটো পাতা টাঙিয়ে দিত পুনরায় সমাজ ভুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সমস্ত সামাজিক উৎসবে তার যোগদান নিষেধ থাকত। পুনরায় সমাজভুক্ত হওয়ার সময় তাকে

পাঁচজনকে খাওয়াতে হতো এবং দেশ মাঝি পরগনা ও মান্যগন্যদের খাওয়ার সময় সে খাবারের মধ্যে সাধ্যমত টাকা পয়সা গুঁজে দিত। খাওয়া দাওয়ার পর সে সমাজভুক্ত বা পাঁচজনের মধ্যে গণ্য হতো। তবে জনগণ ন্যায় ভাবেই বিচার করত কোন গরিবের উপর অন্যায় করা হতো না।

চাষবাস ও জীবিকা সাঁওতালরা বেশির ভাগ কৃষিজীবী। বাকি তারা নানা প্রকারে নানা রকম আবাদ করত। ধান, ভুট্টা, বাজরা, কঁদো, ইডি, গুন্দলি, সরিশা, তিল, অড়হর, মুগ, মাসকলাই সব কিছুই চাষ করত। বনে নানা রকম ফলমূল ও শাকসবজি পাওয়া যেত। আর চারপাশে বেশি ছিল বলে লোকেরা গরু ছাগল মহিষ পালন করত। বন জঙ্গল বেশি থাকায় অনেক মানুষ বাঘের পেটে ও গেছেন অনেকে। তবে জমির উদ্ধার করে তারা কিছু কিছু ধান চাষ করতেন।

ওই সময়ে গভীর জঙ্গল ছিল জীবজন্তু ও অনেক ছিল এবং শিকার ও খুব হতো। শিকার করতে সাঁওতালেরা বড় আনন্দ পেত, কোন দিহরি শিকারের দিন ধার্য করেছে শুনলেই ছেলেরা শিকারে যেত। শিকারে যাওয়ার জন্য নিজের নিজের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র অর্থাৎ তীর ধনুক কাপি তরোয়াল বর্শা এবং সব রকম সাজ পোশাক অর্থাৎ পেটি বন্ধন ঘুঙ্গুর বুনকা পাগড়ী প্রভৃতি পরে শিকারে যেতেন। শিকারে যাবার আগে বেশ কিছু বিশ্বাস সংস্কার তাদের মধ্যে কাজ করতো। পূর্বে শিকারের নিয়ম ছিল শিকারিরা সকলেই নিজের নিজের গ্রামের রাস্তার শেষে এসে হাজির হতেন। সেখানে গ্রামের কোন ওঝা শিকারিদের বিপদ কাটাতেন এই মনে করে যে যদি কোন বিধবা কিংবা কুমারী মেয়ে যাত্রা অশুভ করে থাকে। বিপদ কাটাবার জন্য ওঝা শিকারিদের প্রত্যেকের অস্ত্রশস্ত্র এক জায়গায় রাখতে বলতেন আর যারা শিকার যাচ্ছেন তারা চারপাশে গোলাকার ভাবে ঘুরে দাঁড়াতেন। বেশ কিছু উপাচার দিয়ে এই দোষ কাটানো হতো। নিজের উরু কাঁটা ফুটিয়ে রক্ত বের করে সেই রক্ত আতপ চালে দিয়ে গ্রাম দেবতার কাছে উৎসর্গ করা হতো। যা নিরাপদ শিকার যাত্রার বিশ্বাস বলে মনে করা হতো। তারাশঙ্কর তাঁর ‘অরণ্য-বহি’ উপন্যাসে সিঁধুর শিকার প্রসঙ্গটি সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছেন “সেও কাঁড় ধরে টান দিলে ধনুকো লক্ষ্য করতে করতে তার মনে হল এ লক্ষ্য যদি ঠিক বেঁধে তবে নিশ্চয় মরণবোজা তার উপর খুশি হয়েছেন। এবং সেই টাঙি তিনি তাকে নিশ্চয় দেবেন যাতে সে ওই দিকুদিকে আর ওই সায়েবদিকে এমনি করে একসঙ্গে মেরে ফেলবে। ছেড়ে দিলে সে কাঁড়।” লক্ষ্য যদি স্থির থাকে তবে মরণ বোজা তার প্রতি খুশি হয়ে টাঙি উপহার দেবেন। যা দিয়ে সে শত্রু নিধন করতে পারবে। এখানে শত্রু বলতে বুঝতে হবে হিন্দু দিকু ও ইংরেজ সাহেব। বিবাহ বন্ধনে ছেলে-মেয়েকে আবদ্ধ করার পূর্বে কন্যার পিতা বা মেয়ের বাবা ছেলের [বরের] মরদ বা ক্ষমতা যাচাই করে নিতেন একমাত্র মরদ পুরুষই ছিল তার কন্যার পানীপ্রার্থী। এক্ষেত্রে কয়েকটি লক্ষ্য অতিক্রম করতে পারলে পুরুষ বিবাহের অধিকার অর্জন করতে পারত। যেমন কাঁধে হাল লাগিয়ে জমি চাষের কথা আছে। কোথাও সরাসরি বন্যপ্রাণী ভালুকের সঙ্গে লড়াইয়ের কথা আছে।

সাঁওতাল আদিবাসী অন্ত্যজ এই বিশেষ সম্প্রদায়ের খাদ্যাভাসের বিচিত্র পরিচয় উপন্যাসিক প্রদান করেছেন। সাঁওতালেরা ভোর বেলা ফ্যান ভাতে চারটি খেয়ে নিয়ে দিনের মতো কাজে নামে। সাধারণত ভোর রাতেই ভাত চড়ানো হয়। কখনো কখনো ঘরের কোণে রাখা পচায় মদের হাঁড়ি থেকে কিছুটা মদ ছেকে খেয়ে নেওয়া এদের নিত্য অভ্যাস। এদের যে কোন কিছুতে হাঁড়িয়া জম করে। কেউ কেউ একমুঠো মুড়ি বুট কলাই সিদ্ধ নুন দিয়ে খেতে খেতে কাঁচা লক্ষা দাঁতে কেটে নেয়। তবে সাঁওতালদের ধূমপানের মধ্যে রয়েছে তামাক পাতা দিয়ে বানানো বিড়ি যা চুটি নামে পরিচিত। “নূনের ওদের বড় অভাব। নুন ছাড়া খাওয়ার জন্য ওদের কেনবার কিছু নেই।”^৮ এদের বড় প্রিয় এদের খাবারের কোন অভাব নেই শুধু একটু বুলুং [নুন] হলেই চলে। শিকার করা বন্য জন্তু সামাজিকভাবে বন্টন করে খাওয়া এদের বিশেষ সামাজিক নিয়ম বা দায়বদ্ধতার মধ্যে পড়ে।

তারাশঙ্করের আদিবাসী নির্ভর উপন্যাসগুলির অন্যতম ‘অরণ্য-বহি’। এই উপন্যাসে আদিবাসী সম্প্রদায়ের সাঁওতাল বিদ্রোহের বিজয়গাথা যেমন ফুটে উঠেছে তেমনি উপন্যাসটি বিশ্লেষণে বহু বিচিত্রমন্ডিত সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া গেছে। কোন জাতির কোন সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক গঠনের বিশিষ্টতা ফুটে ওঠে তার সামাজিক আচার সংস্কার বিশ্বাস প্রথা সর্বোপরি তাদের সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে উপন্যাসটি বিশ্লেষণে দেখা যায় লোকসংস্কৃতির স্তরে স্তরে আদিম কৌম সংস্কৃতির উপাদান বিচিত্রভাবে বিন্যস্ত। ভারতের মানব সমাজে যারা জনজাতি প্রাবন্ধিক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায় এরা ‘অন্যত্রত’ তারা উচ্চবর্গীয় সমাজ ব্যবস্থার কাছে অবহেলিত অবজ্ঞাত নিপীড়িত সমাজের এক প্রান্তে যাদের অবস্থান আবর্জনার মতো। উপন্যাসটি বিশ্লেষণে তাদের বাসস্থান সভ্য সমাজ থেকে অনেকটা দূরে কোন জঙ্গলের বা পাহাড়ের প্রান্তে খাদ্য অত্যন্ত নিম্নমানের অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটায় পরিধান অভাবের তাড়নায় নোংরা শতচ্ছিন্ন দারিদ্রতার সঙ্গে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ বহু শতাব্দী প্রাচীন হাজারো আচার

সংস্কার অন্ধবিশ্বাস বাধা তাদের লাঞ্ছিত জীবন শিক্ষার আলোহীন যুক্তিবুদ্ধির ধারণা ধারা আধা ভৌতিক আধা দৈবিক অলৌকিক অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কারের মগ্ন। এই অন্ত্যজ আদিবাসী মানুষগুলির জীবন। এই প্রবন্ধে আদিবাসী সমাজের তথা তাদের জীবনের ধর্মীয় সংস্কার যা বাককেন্দ্রিক বস্তুকেন্দ্রিক সংস্কৃতি বিশ্বাস - অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক সংস্কৃতি এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থানের স্বরূপ উদঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র-

- ১ ড. দুলাল চৌধুরী, বাংলা লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ। পৃষ্ঠা ১৫ (২০০৩)
- ২ ধীরেন্দ্রনাথ বাক্সে, সাঁওতাল গনসংগ্রামের ইতিহাস। পৃষ্ঠা ২৫ (মে ২০০৩ ষষ্ঠ পরিবর্ধিত সংস্করণ)
- ৩ মিত্র ও ঘোষ তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাবলী খণ্ড। ১৮ ষষ্ঠ মুদ্রন 'অরণ্য- বহি' পৃষ্ঠা- ৩১৭ ভাদ্র ১৪১৭ বঙ্গাব্দ
- ৪ মিত্র ও ঘোষ তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাবলী খণ্ড। ১৮ ষষ্ঠ মুদ্রন 'অরণ্য- বহি' পৃষ্ঠা- ২৮৮
- ৫ মিত্র ও ঘোষ তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাবলী খণ্ড। ১৮ ষষ্ঠ মুদ্রন 'অরণ্য- বহি' পৃষ্ঠা- ৩০৭
- ৬ ধীরেন্দ্রনাথ বাক্সে, সাঁওতাল গনসংগ্রামের ইতিহাস। পৃষ্ঠা ১৬১ পরিশিষ্ট
- ৭ মিত্র ও ঘোষ তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাবলী। খণ্ড - ১৮ ষষ্ঠ মুদ্রন 'অরণ্য- বহি' পৃষ্ঠা- ৩০৮

সহায়ক গ্রন্থ

১. আদিত্য মুখোপাধ্যায় 'তারাক্ষরঃ সময় ও সমাজ'।
২. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা [দুই খণ্ড]।
৩. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা ।
৪. মহীতোষ বিশ্বাস, বাংলা উপন্যাস প্রসঙ্গ ; আঞ্চলিকতা।
৫. রঞ্জিতকুমার মুখার্জি, তারাক্ষর ও রাঢ় বাংলা
৬. দেশ, তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৫
৭. মিত্র ও ঘোষ সম্পাদিত আকর গ্রন্থ তারাক্ষর রচনাবলী, [১-২৪ খণ্ড]
৮. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, কালের প্রতিমা
৯. ড. নিতাই বসু, তারাক্ষরের শিল্পীমানস, দে'জ পাবলিসিং, কলকাতা
১০. উজ্জল কুমার মজুমদার, 'তারাক্ষরঃ দেশ কাল সাহিত্য'
১১. তারাক্ষর রচনাবলী ১৮তম খণ্ড 'অরণ্য - বহি' আকর গ্রন্থ